ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় পানি ব্যপস্থাপনা

ড.মনিরুল আলম

বাংলাদেশ একশ বছর মেয়াদের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ তৈরি করেছে। এ পরিকল্পনায় ৯টি জলাশয় রয়েছে। IUCN ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশকে যে ভাগ করেছে, সেখানে ২৫টি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে চাইলে বদ্বীপ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নদী ও জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করতে হবে। নদী রক্ষার জন্য উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। যেসব নদী ও জলাশয় ভরাট হচ্ছে, দখল থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সর্বস্তরের সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর বা River Information System (নদীর তথ্য পদ্ধতি) উন্নত করা নেই, যেমন সীমানায় কতগুলো নদী আছে, নদীগুলোর পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা। River Information System, Wetland Information System, Citzen Information System উন্নত করা সম্ভব হলে মানুষ, জলাশয়, প্রকৃতিকে একসাথে করা সম্ভব। প্রতি ছয় মাসে বা এক বছরে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে নদীর তথ্যসংবলিত কোনো অ্যাপ বা কোনো ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে, যেখান থেকে নদীর পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা জানা যাবে এবং সাধারণ লোকজন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সহজেই সমস্যাগুলো শনাক্ত করা যাবে। তাহলে খুব সহজে সরকার নদী ও জলাভূমি রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে পারবে এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হবে। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

জলাভূমি ও নদী স্বাদুপানির একটি বড়ো উৎস। শহরের প্রতিদিনের ব্যবহৃত পানি, চাষাবাদ ও শিল্পকারখানার উৎপাদনের পানি জলাভূমি ও নদী থেকে নেওয়া হয়। মানুষের বিভিন্ন কমর্কাণ্ডের মাধ্যমে জলাশয় ও নদীর পানি দূষিত করছে। পানিদূষণের মাধ্যমে পানির নিরপিত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। পানিদূষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ ছড়ায়। দূষিত পানিতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ, ভারী ধাতু (আর্সেনিক, লেড, মার্কারি, প্রভৃতি) থাকে। এ কারণে দূষিত পানি ব্যবহারে ক্যান্সারসহ মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। দুর্বল গোষ্ঠী, বিশেষ করে গর্ভবতী মা, নবজাতক, পাঁচ বছরের নিচের শিশু বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা খরচ বেড়ে যায়, তাদের কাজের সময় কমে যায় এবং দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। চাষাবাদের সময় অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, শিল্পকারখানার বর্জ্য প্রতিনিয়ত পানির সঙ্গে মিশে মাটি ও পানি দূষিত করছে। এতে মাটির উবর্র তা কমছে, দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভাব ফেলে। লিঙ্গসমতা করতে হলে প্রথমে নারীর মত প্রকাশের অধিকার, স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজননের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কীটনাশক দ্বারা আক্রান্ত দূষিত পানি নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও হরমোনের সংবেদনশীল টিস্যুর ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া ব্রেস্ট ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। নারীর নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার করা সম্ভব নয়। শিল্প এলাকাগুলোয় অতিরিক্ত কার্বন নির্গত হওয়ার কারণে ফ্যাক্টরিতে কাজ করা লোকজন ও শিল্প-এলাকাগুলোয় বা আশপাশে বসবাসরত লোকজনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি থাকে। অতিরিক্ত কার্বন নির্গত হওয়ার কারণে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে উপকূলীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মাঝি, জেলে, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়াও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দূষণ অধঃক্ষেপণ বেড়ে যায়, বৃষ্টির সঙ্গে কীটনাশক ছড়িয়ে পড়ে, অতিরিক্ত ঝড় ও বৃষ্টির মাধ্যমে দূষিত পদার্থ ছড়িয়ে পানিদূষণ বাড়িয়ে দেয়। বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনে পানিদূষণ বিস্তারলাভ করবে। পানিদূষণের কারণে পানিতে বসবাসকারী প্রজাতিগুলোর জীবন হুমকির মুখে পড়ে। প্রবাহের মাধ্যমে দূষণ ছড়িয়ে যাচ্ছে জলাশয় থেকে খালবিল, নদী, সমুদ্রে। সেখানে থাকা প্রাণীগুলোর টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পানিদূষণ রোধ না করলে পানিতে থাকা প্রজাতি হারিয়ে যাবে। এছাড়া বর্ষার পানিতে দূষিত পানি মিশে চারদিকে ছড়িয়ে ভূমিকেও দূষিত করে। এতে ফসল উৎপাদনের জমি অনুর্বর হয়, মানুষের মাঝে পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে যায়, ভূমিতে থাকা গাছপালা, পশুপাখি মারা যায়।

জলাভূমি ও নদীর পানিদূষণ বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জ। পানিদূষণ শুধু মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যও হুমকিস্বরূপ। পানিদূষণ রোধ করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। পানিদূষণ রোধে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে দূষণের উৎস ও কারণ। জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার রোধ করতে হবে, বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে, শিল্পকারখানার বর্জ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিটি কারখানায় ট্রিটমন্টে প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে, নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে, পরিকল্পিতভাবে নগর পরিকল্পনা, সর্বোপরি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পানিদূষণ রোধ করা সম্ভব। পানিদূষণ মোকাবিলায় জনগণের স্বক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে, সরকারি -বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তখনই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

পানিদূষণ, পরিশোধন ও উপাদানগুলোর গ্রহণযোগ্য মাত্রা পৃথিবীর পৃষ্ঠে উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব ও তাদের প্রজাতি কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে রয়েছে। প্রাণবৈচিত্র্য প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং প্রাণের বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশের অবক্ষয় রোধে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। পৃথিবীর প্রাণবৈচিত্র্য টিকে থাকার জন্য পানির ওপর নির্ভরশীল। পানির সঙ্গে পলিথিন, প্লাস্টিক, শিল্পকারখানার বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য, সলিড বর্জ্য, প্রাণিজ বর্জ্য , কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিষাক্ত কীটনাশক ও বিভিন্ন ধরনের সার মিশে পানিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। এতে পানি পান ও ব্যবহারের অযোগ্য হচ্ছে, প্রাণবৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

পানিদূষণের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর তিনভাগ পান উপযোগী পানির অবস্থা খারাপ। বিভিন্ন কারণে পানি যেভাবে দূষিত হচ্ছে, এ দূষিত অবস্থা থেকে পানিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত করতে পারলেও অনেক বিবেচনার বিষয় ও প্রশ্ন থেকে যায়। যে পরিমাণ পানি আমরা দূষিত করছি, সেই পরিমাণ পানি কি আমরা বিশুদ্ধ করতে পারছি? পানি বিশুদ্ধ করতে পারলেও তা করতে যে ব্যয় হচ্ছে, সেই ব্যয় কি সবাই বহন করতে পারবে? ভবিষ্যতে কত দামে আমাদের পানি কিনতে হবে?

পানিদূষণের দায় ও বাস্তবতার জায়গা থেকে পানিকে দূষণমুক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে শিল্পকারখানার বর্জ্য ও পানিকে ট্রিটমেন্ট না করা, ট্রিটমেন্টসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বড়ো একটি অংশের অদক্ষতা এবং পানির উপাদান ও উপাদানগুলোর সঠিক মান সম্পর্কে ধারণা না থাকা। মানুষের গৃহস্থালির বর্জ্য, শিল্পকারখানার বর্জ্য, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, সলিড পদার্থ, কীটনাশক, সার পানিতে মিশে জলাশয়, নদী, খালবিল, হাওড় বাঁওড়ের পানিকে দূষিত করছে। আবার মানুষ সেই জলাশয় ও নদীর পানিকে বিভিন্নভাবে পরিশোধন করে ব্যবহার করছে। জলাশয় ও নদীর পানিকে বিভিন্ন ধাপে পরিশোধন ও ব্যবহার উপযোগী করা হয়। প্রথমত, পানিতে থাকা বড়ো কণা ও পদার্থ যেমনঃ প্লাস্টিক বোতল, পলিথিন, কাগজ প্রভৃতি অপসারণ করা হয়। দ্বিতীয়ত, পানিকে কোয়াগুলেশন বা ফ্লোকুলেশন বেসিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কোয়াগুলেন্টস বা জমাট বাঁধা পদার্থ যেমনঃ অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত পলিডেডমার্ক যুক্ত থাকে। কোয়াগুলেশন বা ফ্লোকুলেশন বেসিনে পানি থেকে বিভিন্ন কণা, ময়লা, রং অপসারন করে পানিকে স্পষ্ট ও বর্ণহীন করে শোধন করা হয়। তৃতীয়ত, পানিকে বর্ণহীন করার পর সেডিমেন্টেশন বেসিনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যেখানে পানিতে থাকা অধঃক্ষেপ অপসারণ করা হয়। চতুর্থত, পানি থেকে অধঃক্ষেপ অপসারণের পর পানিকে ফিল্টারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যেখানে পানিতে থাকা অবশিষ্ট কণা, অধঃক্ষেপ অপসারণ করা হয়। পঞ্চমত,পানিকে ডিসইনফেকটেন্ট বেসিনে প্রবাহিত করা হয় ডিসইনফেকশন বা জীবাণুনাশক করার জন্য। পানিতে জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ ক্লোরিন যুক্ত করা হয় যাতে পানিতে থাকা সম্ভব্য প্যাথোজেন বা অণুজীব যেমনঃ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া যাদের মধ্যে রয়েছে ইসছেরিছিয়া কোলাই, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার, শিগেলা প্রভৃতি অপসারণ করে পানিকে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। সুস্থ জলজ জীবনের জন্য পানির স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার কী? পানিকে শুধু ট্রিটমেন্ট বা পরিশোধন করলেই ব্যবহার উপযোগী হয় না, পানির প্যারামিটারগুলোর মাত্রা ঠিক রাখতে হয়। বিশ্বে এবং বাংলাদেশে পানির উপাদানগুলোর একটি স্ট্যান্ডার্ড মান বজায় রেখে পানিকে পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বর্জ্য পানির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পানির প্যারামিটারের যে মান নির্দিষ্ট করেছে, বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে মিল রেখে পানির কিছু উপাদানের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মান নির্ধারণ করেছে।

পানিতে ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত সমস্যা, যা উদ্ভিদ-প্রাণী বা মানুষ যেসব জীবের সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি রয়েছে। ভারী ধাতু ক্ষতিকারক পরিবেশ দূষণকারী, যা জীবের ওপর উচ্চ বিষাক্ত প্রভাব ফেলে। ভারী ধাতুগুলো পানিতে বা মাটিতে প্রবেশ করলে তা জমা হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশের (বর্তমানে সবজি ও মাছে পাওয়া যাচ্ছে) মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। মানবদেহে ভারি ধাতুর উপস্থিতি বিভিন্ন অঙ্গ যেমনঃ স্নায়ুতন্ত্র এবং কিডনির ক্ষতি করতে পারে। বর্জ্য পানি বা দূষিত পানিকে যখন টিট্র মেন্ট করা হবে, তখন উপরিউক্ত প্যারামিটারগুলো ভালোভাবে চেক করা প্রয়োজন। এছাড়াও আনুষঙ্গিক আরও প্যারামিটার চেক করা প্রয়োজন। তবে এগুলো চেক করলে অন্যগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশ সেভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। এখনো অনেক প্যারামিটারের মাত্রা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমনঃ ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের পর TSS-এর মাত্রা আন্তর্জাতিকভাবে রাখা হয়েছে ৩০ সম/ষঃ, সেখানে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা ১৫০ সম/ষঃ। আন্তর্জাতিক এনভায়রনমেন্ট স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে এখন থেকেই বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি শিল্পকারখানায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বাধ্যতামূলক করেতে হবে। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে দূষিত পানি ট্রিটমেন্টের পর পানির প্যারামিটারগুলোর আরও স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ওয়েস্ট ওয়াটার জলাভূমিতে ছাড়ার আগে ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট

করে প্যারামিটারগুলোর মাত্রা ভালোভাবে চেক করে ছাড়তে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে তদারকি করতে হবে। পানিদূষণ রোধ করতে পারলে নদী, জলাভূমি ও প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

#

পিআইডি ফিচার